বাদশাহ নামদার

হুমায়ূন আহমেদ

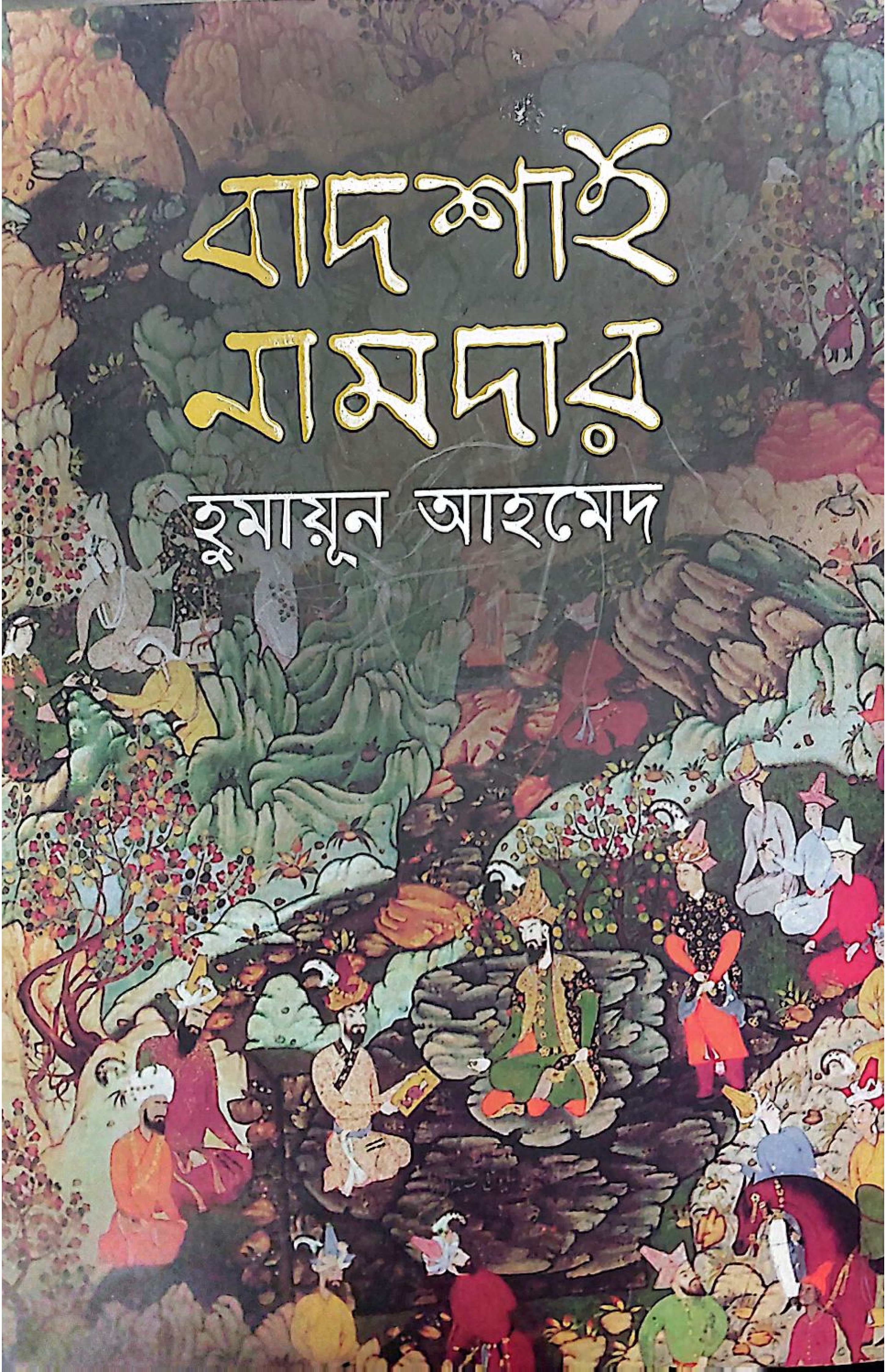

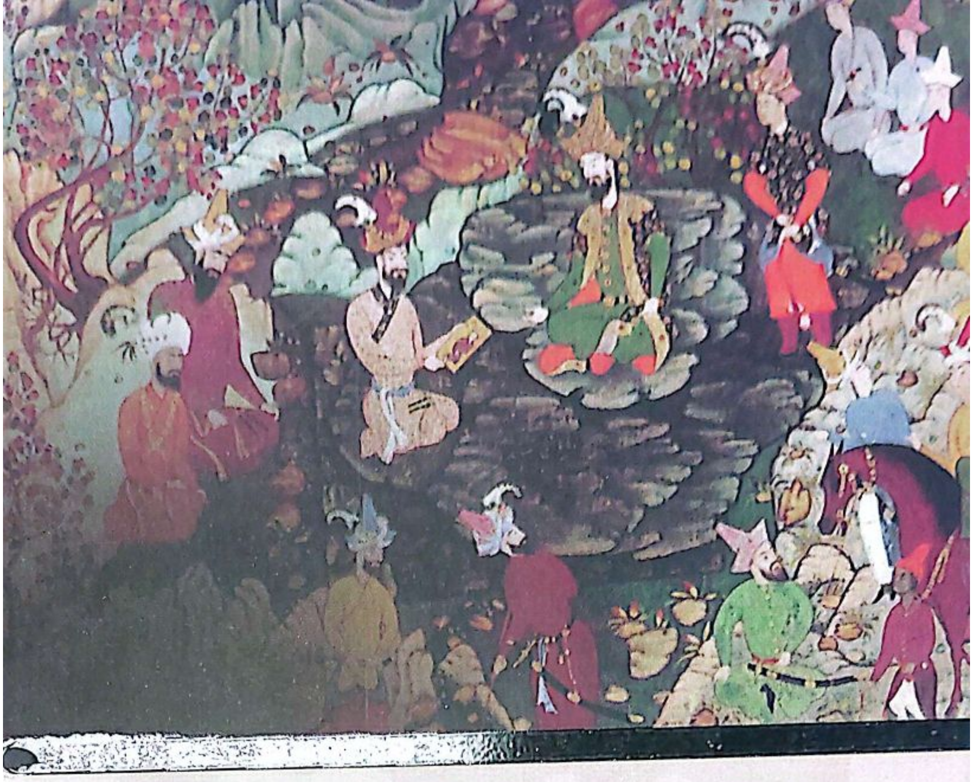

"দর আইনা গরচে খুদ নুমাই বাশদ
পৈবস্তা জ খেশতন জুদাই বাশদ।
খুদ রা ব মিসলে গোর দীদন অজব অস্ত;
ঈ বুল অজবো কারে খুদাই বাশদ।"

যদিও দর্পণে আপন চেহারা দেখা যায়
কিন্তু তা পৃথক থাকে
নিজে নিজেকে অন্যরূপে দেখা
আশ্চর্যের ব্যাপার।
এ হলো আল্লাহর অলৌকিক কাজ।

[হিন্দুস্থানের অধীশ্বর দিল্লীর সম্রাট শের শাহকে পাঠানো
রাজ্যহারা হুমায়ূনের কবিতা]

বাদশাহ নামদার

হুমায়ূন আহমেদ

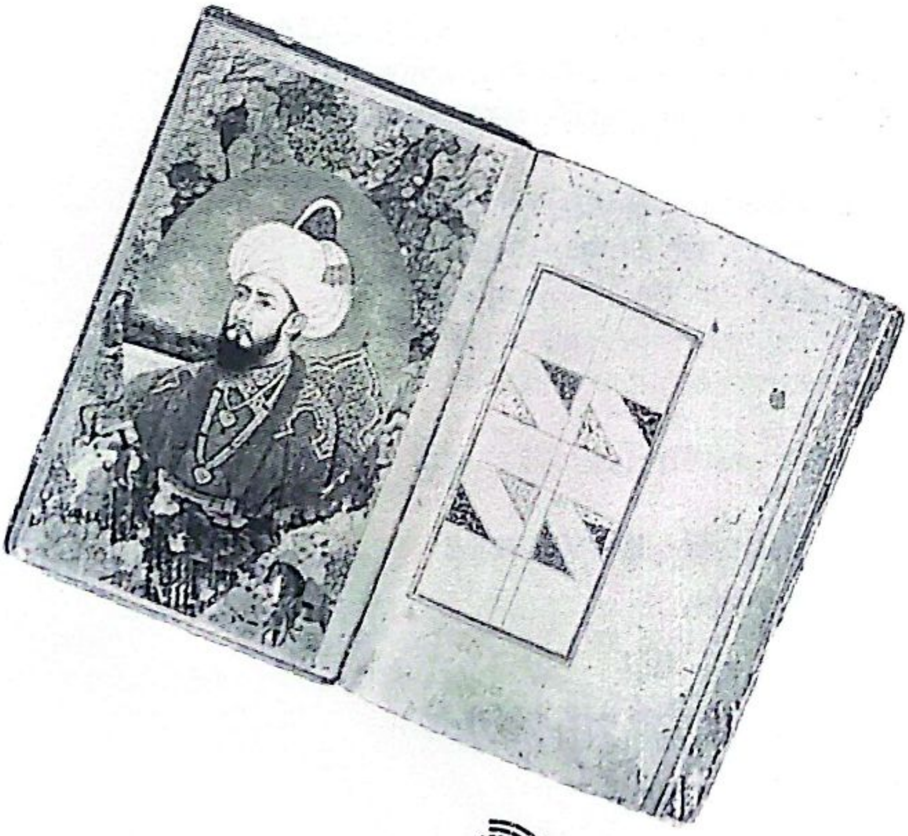

অন্যপ্রকাশ

“রাজ্য হলো এমন এক রূপবতী তরুণী
যার ঠোঁটে চুমু খেতে হলে
সুতীক্ষ্ণ তরবারির প্রয়োজন হয়।”

(হুমায়ূনের বিদ্রোহী ভ্রাতা মির্জা কামরানের
লেখা কবিতা)

ভূমিকা

কেউ যদি জানতে চান 'বাদশাহ নামদার' লেখার ইচ্ছা কেন হলো, আমি তার সরাসরি জবাব দিতে পারব না। কারণ সরাসরি জবাব আমার কাছে নেই।

শৈশবে আমাদের পাঠ্যতালিকায় চিতোর রানীর দিল্লীর সম্রাট হুমায়ূনকে রাখি পাঠানো-বিষয়ক একটা কবিতা ছিল। একটা লাইন এরকম: "বাহাদুর শাহ্ আসছে ধেয়ে করতে চিতোর জয়।" এই কবিতা শিশুমনে প্রবল ছাপ ফেলে বলেই শেষ বয়সে সম্রাট হুমায়ূনকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে বসব এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই।

সব ঔপন্যাসিকই বিচিত্র চরিত্র নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। এই অর্থে হুমায়ূন অতি বিচিত্র এক চরিত্র। যেখানে তিনি সাঁতারই জানেন না সেখানে সারা জীবন তাঁকে সাঁতরাতে হয়েছে স্রোতের বিপরীতে। তাঁর সময়টাও ছিল অদ্ভুত। বিচিত্র চরিত্র এবং বিচিত্র সময় ধরার লোভ থেকেও *বাদশাহ নামদার* লেখা হতে পারে। আমি নিশ্চিত না।

আমার নিজের নাম হুমায়ূন হওয়ায় ক্লাস সিক্স-সেভেনে আমার মধ্যে শুধুমাত্র নামের কারণে এক ধরনের হীনমন্যতা তৈরি হয়। সেই সময়ের পাঠ্যতালিকায় মোঘল ইতিহাস খানিকটা ছিল, তাতে শের শাহ্'র হাতে হুমায়ূনের একের পর এক পরাজয়ের কাহিনী। হুমায়ূনের পরাজয়ের দায়ভার খানিকটা আমাকে নিতে হয়েছিল। ক্লাসে আমাকে ডাকা হতো 'হারু হুমায়ূন'। কারণ আমি শুধু হারি। আমি কার কাছে হারি ? মহান সম্রাট শের শাহ্'র হাতে—যিনি ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন, গ্রান্ডট্রাংক রোড বানান। আমি শুধু পালিয়ে বেড়াই। হায়রে শৈশব!

এমন হওয়া অসম্ভব না যে শৈশবের নাম নিয়ে হীনমন্যতাও *বাদশাহ নামদার* লিখতে খানিকটা ভূমিকা রেখেছে।

আচ্ছা ঠিক আছে বাদশাহ নামদার লেখার কারণ জানা গেল না, তাতে জগতের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি লিখে প্রবল আনন্দ পেয়েছি—এটাই প্রথম কথা এবং শেষ কথা।

সম্রাট হুমায়ূন বহু বর্ণের মানুষ। তাঁর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে আলাদা রঙ ব্যবহার করতে হয় নি। আলাদা গল্পও তৈরি করতে হয় নি। নাটকীয় সব ঘটনায় তাঁর জীবন পূর্ণ।

উপন্যাসটি লেখার সময় প্রচুর বইপত্র বাধ্য হয়ে পড়তে হয়েছে। একটি নির্ঘণ্ট দিয়ে নিজেকে গবেষক-লেখক প্রমাণ করার কারণ দেখছি না বলেই নির্ঘণ্ট যুক্ত হলো না।

বাদশাহ নামদারের বিচিত্র ভুবনে সবাইকে স্বাগতম।

হুমায়ূন আহমেদ
দখিন হাওয়া
ধানমণ্ডি

বাঙ্গালমুলুক থেকে কাঁচা আম এসেছে। কয়লার আগুনে আম পোড়ানো হচ্ছে। শরবত বানানো হবে। সৈন্ধব লবণ, আখের গুড়, আদার রস, কাঁচা মরিচের রস আলাদা আলাদা পাত্রে রাখা। আমের শরবতে এইসব লাগবে। দু'জন খাদ্যপরীক্ষক প্রতিটি উপাদান চেখে দেখেছেন। তাঁদের শরীর ঠিক আছে। মুখে কষা ভাব হচ্ছে না, পানির তৃষ্ণাবোধও নেই। এর অর্থ উপাদানে বিষ অনুপস্থিত। সম্রাট বাবর নিশ্চিন্ত মনে খেতে পারবেন। গত বছর শীতের শুরুতে সম্রাট বাবরকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। এরপর থেকেই বাড়তি সতর্কতা।

সম্রাট তখ্‌ত্‌ রওয়ানে (চলমান সিংহাসন) আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর মাথায় রাজস্থানী বহুবর্ণ ছাতি। তাঁর দু'দিকে দু'জন বড় পাখায় হাওয়া দিচ্ছে। প্রধান উদ্দেশ্য মাছি তাড়ানো। এই অঞ্চলে মাছির বড়ই উৎপাত।

রুপার পাত্রে আমের শরবত নিয়ে খিদমতগার সম্রাটের সামনে নতজানু হয়ে আছে। সম্রাট পাত্র হাতে না নেওয়া পর্যন্ত খিদমতগার মাথা উঁচু করবে না। সম্রাট পাত্র হাতে নিচ্ছেন না। তাঁকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। যদিও চিন্তিত হওয়ার মতো কারণ ঘটে নি। পানিপথের যুদ্ধে তাঁর প্রধান শত্রু ইব্রাহিম লোদী পরাজিত এবং নিহত হয়েছেন। ইব্রাহিম লোদীর মৃতদেহ তাঁকে দেখানো হয়েছে। তবে বিরক্ত হওয়ার মতো কারণ ঘটেছে। তিনি তাঁর প্রথম পুত্র নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ূন মীর্জার উপর বিরক্ত। এই ছেলে অলস এবং আরামপ্রিয়। সে ঘর-দরজা বন্ধ

করে একা থাকতে পছন্দ করে। পিতাকে লেখা এক পত্রে সে লিখেছে—'আমার মানুষের সঙ্গ ভালো লাগে না। আমি একা থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।' একাকিত্ব রাজপুরুষদের মানায় না। হুমায়ূনকে পাঠানো হয়েছে ইব্রাহিম লোদীর রাজধানী এবং কোষাগার দখল করতে। ইব্রাহিম লোদীর কোষাগার আগ্রা দুর্গে। এই কাজ শেষ করতে এত সময় লাগার কথা না। সে নিশ্চয়ই কোনো ভজঘট করে ফেলেছে। দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার মতো দায়িত্ববান হুমায়ূন মীর্জা না। সম্রাট নিজেই আগ্রার দিকে রওনা হয়েছেন। কাঁচা আমের শরবত খাওয়ার জন্যে যাত্রাবিরতি।

সম্রাটের সেনাপতির একজন ফিরোজ সারাঙ্গখানি বললেন, বাদশাহ কি কোনো কারণে অস্থির ?

বাবর বললেন, আমি অস্থির, তবে অস্থিরতার কারণ জানি না। গত রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দুঃস্বপ্ন অস্থিরতার কারণ হতে পারে।

ফিরোজ সারাঙ্গখানি দুঃস্বপ্ন কী জানতে চাচ্ছেন। কিন্তু সম্রাটের দুঃস্বপ্ন জানতে চাওয়া যায় না। বড় ধরনের বেয়াদবি।

সম্রাট বললেন, দুঃস্বপ্ন কী জানতে চাও ? শোনো। আমি দেখলাম আমার তাঁবুতে একটা ভেড়া ঢুকে পড়েছে। ভেড়াটার একটা পা নেই, সে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ভেড়াটা লাফ দিয়ে আমার কোলে এসে পড়ল এবং আমার পায়ে মুখ ঘষতে লাগল। তখনই ঘুম ভাঙল।

স্বপ্নের ফলাফল অবশ্যই শুভ।

একটা পঙ্গু ভেড়া লাফ দিয়ে আমার কোলে এসে উঠল। এর ফলাফল শুভ কীভাবে হয় ? হুজুর মীর আবুবকার-এর কাছ থেকে স্বপ্নের তাবির জানতে হবে।

কথা বলতে বলতেই বাবর তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। অনেক দূরে ধুলার ঝড়ের মতো উঠেছে। অশ্বারোহীর দল কি ছুটে আসছে ? কোনো

বিদ্রোহী বাহিনী ? হওয়ার তো কথা না। অশ্বারোহীর দল আগ্রার দিক থেকেই আসছে। এমন কি হতে পারে আগ্রার দুর্গে বন্দি গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমাদিত্যের পরিবারকে উদ্ধার করতে সাহায্যকারী কেউ এসেছে ?

বাবর ইশারা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার পরিস্থিতি তৈরি হলো। সিঙ্গা বাজানো হলো। বাদশাহের প্রিয় পিতজুচাক ঘোড়া নিয়ে একজন ছুটে এল। বাদশাহ তখ্‌ত্‌ রওয়ান ছেড়ে ঘোড়ায় উঠলেন। দূরে ধুলার ঝড় ঘন হচ্ছে। সৈন্যসংখ্যা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে রোদে ঘোড়ার আরোহীদের শিরস্ত্রাণ ঝলসে ঝলসে উঠছে।

বাবরের সংবাদ সরবরাহ দলের চারজন ঘোড়সওয়ার ছুটে যাচ্ছে। তাদের হাতে আয়না। তারা আয়নার আলো ফেলে বোঝার চেষ্টা করবে কারা এসেছে।

সম্রাট বাবরের চোখমুখ শক্ত। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি সহজ হলো। তিনি শরবতের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালেন। সৈন্যবাহিনী নিয়ে কে আসছেন তিনি জানেন। আসছে পুত্র হুমায়ূন মীর্জা।

যুদ্ধাবস্থার তাতে পরিবর্তন হলো না। সম্রাটদের পুত্র থাকে না, ভাই থাকে না। তারা সবসময়ই একা। হুমায়ূন যে সসৈন্যে তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে না এর নিশ্চয়তা কোথায় ? হুমায়ূন মীর্জার অধীনে বিশাল সৈন্যবাহিনী আছে। আগ্রা দুর্গ দখল করার জন্যে পাঁচ শ' অশ্বারোহীর একটি বিশেষ দল সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে। বাবর বিড়বিড় করে নিজের রচনা চারপদী কবিতা আবৃত্তি করলেন—

সম্রাটের বন্ধু তার সুতীক্ষ্ণ তরবারি
এবং তার ছুটন্ত ঘোড়া আর তার বলিষ্ঠ দুই বাহু
তার বন্ধু নিজের বিচার
এবং পঞ্জরের অস্থির নিচের কম্পমান হৃদয়।